ভালবেসে পড়াও

কিছুদিন আগে সাড়ে তিন বছরের এক শিশুর আর্তনাদ অনেকেই দেখেছেন এবং শুনেছেন। ছবিটি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল এবং দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছিল বলে অনেকেরই নজর এড়িয়ে যায়নি। যেখানে আতঙ্কগ্রস্ত একটি শিশু তার শিক্ষাদাত্রীকে আবেদন করছে, 'পেয়ারসে পড়াইয়ে'। আমরা অনেকেই এই চিত্র দেখে আঁতকে উঠলেও এটা বাস্তব সত্য যে আমাদের সংস্কৃতিতে শিশুকে পড়াবার জন্য যে ভালবাসা ও স্নেহ প্রয়োজন, শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যে প্রাথমিক ধ্যান-ধারণা থাকাটা জরুরি তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। পরিবর্তে লাঠি হাতেই শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। এছাড়া চক, ডাস্টার ছুঁড়ে মারা, দুই আঙ্গুলের ফাঁকে পেন্সিল দিয়ে চাপ দেওয়া, নিল ডাউন করে রোদের মধ্যে শিশুকে দাঁড় করিয়ে রাখার মতো নিষ্ঠুর আচরণ প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষকদের কাছ থেকে আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি।

লালবিহারী দে-র 'গোবিন্দ সামন্ত' গ্রন্থে আমরা সেই সময়ের পণ্ডিতদের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ছাত্র শাসনের ভয়ঙ্কর রূপ দেখতে পাই। 'নিয়ম শৃঙ্খলা *রক্ষার দিকে রামরূপের ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ক্রাচছাড়া মস্ত বড় একটা বাঁশের কঞ্চিও সবসময়েই তার কাছ থাকত। শুধু ছাত্রদের পিঠে ও মাথাতে এই বংশদণ্ড বেজে উঠত। মারবার অনেক কৌশলও*

জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৭

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক–এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

সে জানত, ছাত্রদের আঙ্গুলের গাঁট, হাঁটুর গোড়ালিতে আঘাত করত। স্কুলের সময় এই বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে হলে বাঁশের কঞ্চির সপাং সপাং শব্দ কানে না এসেই পারত না। নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার আরো অনেক ফন্দি সে জানত। ছেলেদের শাস্তি দেওয়ার এক বিখ্যাত পন্থা ছিল নাড়ুগোপাল প্রক্রিয়া। অপরাধী বালককে এক হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসিয়ে, প্রসারিত দুই হাতের উপর দু'খানা ইট পড়লে আর রক্ষা নেই, অপরাধীর মাথার উপর অনবরত কঞ্চির আঘাত বর্ষিত হত। রামরূপের দণ্ডবিধির আর একটি ধারা বেশ উল্লেখযোগ্য। অপরাধী বালককে, এই বিধি অনুসারে, পূর্বোক্ত কাঁঠাল গাছের গুঁড়িতে হাত পা বাঁধা অবস্থায় আটকে ফেলে, তার সারা অঙ্গে বিছুটির পাতা প্রয়োগ করা হত। নখ দিয়ে আঁচড়িয়ে প্রদাহের যে কিছুটা উপশম করবে তারও উপায় থাকত না। বেচারীর পক্ষে তখন আর্তনাদ করা ছাড়া আর উপায় কি? এই সমস্ত শাস্তি রামরূপের উর্বর মস্তিস্কপ্রসূত নয়। চিরন্তনী প্রথা হিসেবেই পল্লী বাঙলার পণ্ডিত মহাশয়গণ এর অনুসরণ করে এসেছেন দীর্ঘ সময় ধরে।'' (গোবিন্দ সামন্ত, লালবিহারী দে, ভাষান্তর দেবীপদ ভট্টাচার্য্য, সেরিবান, ২০১৩)।

লক্ষ্য করার বিষয় হল শিক্ষার্থীদের শাস্তি প্রদানের এই নিষ্ঠুর পদ্ধতি কেবলমাত্র একজন বা দুজন পণ্ডিতের মনের খেয়াল নয়, দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা এক প্রথা।

পথের পাঁচালী উপন্যাসের .... মুদি দোকানের পাশে যে পাঠশালা সেখানেও একটি লাঠি ছাড়া আর কোনও শিক্ষার উপকরণের দেখা মেলে না।

হাসান আজিজুল হক তাঁর 'হারানো দেশ-কালের কথা'তে লিখেছেন, 'আমি প্রত্যেক -দিন স্কুলের মাঠে যাই। যে ক্লাসে ঢুকে আমি ক্লাস করব সেই ক্লাসের বাইরে থেকে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতাম। শিক্ষক আসছেন, হাতে একটা বেত। একেক শিক্ষক একেক ঢং-এর ধুতি পরে আসতেন। কেউ মোটা ধুতি, কেউ ফিনফিনে ধুতির উপর হাফ শার্ট, কেউ ফুল শার্ট। আর প্রত্যেকের হাতেই একটা করে বেত, মানে কঞ্চি। এর খুব অন্যায় একটা দিক ছিল। কঞ্চিগুলো কেটে পাতা ঝরিয়ে দিয়ে ছোট ছোট ডাল সামান্য কেটে গিঁটগুলো রাখা হত। কঞ্চির ধারাল জায়গাগুলো সাফ করত না। এগুলো করতে গেলে অনেক ঝামেলা করতে হবে। মাস্টারমশাইরা ওইরকম কঞ্চি আমাদের পিঠে ভাঙতেন। ফলে শুধুমাত্র যে বেতের দাগ পড়ত তা নয়, জায়গায় জায়গায় গর্তও হয়ে যেত।

ছাত্র শাসনতন্ত্র লেখায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ছাত্রকে জেলের কয়েদি বা ফৌজের সিপাই বলিয়া আমরা তো মনে ভাবিতে পারিনা। আমরা জানি, তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড় বিচিত্র করিয়া গড়া। এইজন্যই মানুষের মাথা ধরিলে মাথায় মুগুর মারিয়া সেটা সরানো যায় না'।

তিনি আরও বলেছেন, 'যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জেন্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনোমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তাঁরাই

শেষাংশ ৪ পাতায় ...

সম্পাদকীয়

শিশু সুরক্ষা

নানা কারণে সমপথ প্রকাশে দেরি হল। এই সময়কালে শিশুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে নিত্যদিন। নিজের বাড়ি থেকে বিদ্যালয় সর্বত্রই শিশু হিংসার শিকার। কিছু খবর সংবাদপত্রের পাতায় এসেছে। কিছু খবর নিয়ে হইচই হয়েছে। কিছু ঘটনা আরও অনেক ঘটনার আড়ালে চলে গেছে। সময়ের নিরিখে সব কিছু বিচার করে দেখা হয়। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো, ২০১৬-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সারা দেশেই শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে। ২০১৫ সালে যা ছিল ৯৪১৭২, ২০১৬ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১০৬৯৫৮। আমাদের রাজ্যেও শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে। ২০১৫ সালে যা ছিল ৪৯৬৩, ২০১৬ সালে তা হয়েছে ৭০০৪।

নার্সিং হোম থেকে শিশু পাচার, সেখানে চিকিৎসক থেকে রাজনৈতিক নেতার যোগাযোগ নিয়ে কিছুদিন সংবাদমাধ্যম ব্যস্ত ছিল। শহরের নামকরা বেসরকারি বিদ্যালয়ে ৪ বছরের শিশুর যৌন হেনস্থা নিয়েও সংবাদমাধ্যম থেকে আমজনতা কিছুদিন সময় দিয়েছে। কিন্তু প্রতিদিন 'শিশুর ভালর জন্য' তাঁদের বাবা-মায়েদের হাতে কত শিশুকে নির্যাতনের শিকার হতে হয় সে হিসাব কে রাখে?

আসলে সরকারি বা বেসরকারি তথ্য পরিসংখ্যান থেকে শিশুর বিরুদ্ধে ঘটে চলা অপরাধের মাত্রা বোঝা সম্ভব নয়। কারণ শিশুর অধিকার বা কোন ঘটনাকে শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণ্য করা হবে এই বিষয়ে জনসচেতনতা নেই বললেই চলে। ফলে এদেশের অধিকাংশ শিশুকেই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েই বড় হয়ে উঠতে হয়। পরবর্তী জীবনেও এর প্রভাব পড়ে। মনস্তত্ত্ববিদ থেকে সমাজতত্ত্ববিদ সকলেই একথা জানেন যে শিশুর ওপর নির্যাতন কীভাবে পরবর্তী সময়ে শিশু ও সমাজের ওপর প্রভাব ফেলে।

আশার কথা আমাদের রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ সক্রিয়ভাবে শিশু সুরক্ষায় এগিয়ে এসেছে। শিশু সুরক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ইতিমধ্যেই নানা পদক্ষেপ আয়োগের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। একাজে আয়োগ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে চলার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, শিশু সুরক্ষায় তা কিছু ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আশা করা যায় ভবিষ্যতে শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসবে। আমাদের কাজ করে যেতে হবে, যতদিন একটি শিশুর ওপরও নির্যাতনের ঘটনা ঘটবে। সমাজ-পরিবার-বিদ্যালয় সর্বত্র বড়দের বুঝতে হবে, ভালবাসাই শিশুর বিকাশের পথ।

পুস্তক পরিচিতি

ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা ভীতি কাটাতে একটি প্রয়োজনীয় বই

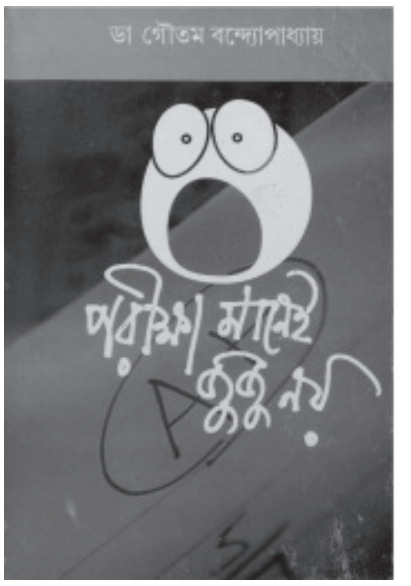

মন নিয়ে কাজ। মন নিয়েই অধ্যাপনা। মনোরোগের চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি নিয়মিত লেখালেখিও করেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরীক্ষা ভীতি স্বাভাবিক কারণেই তাঁর নজর এড়িয়ে যায়নি। ডা. গৌতম বন্দোপাধ্যায় সেই কারণেই কলম ধরেছেন পরীক্ষা ভীতি কাটাতে। 'পরীক্ষা মানেই জুজু নয়', এই শিরোনামে একটি প্রয়োজনীয় বই তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। পরীক্ষা ভীতি কাটিয়ে উঠে কীভাবে ছাত্রছাত্রীরা পড়ালেখায় মনোযোগ দেবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি পরিশেষে বাবা-মায়েদের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় কিছু কথা লিখেছেন। 'পরীক্ষা ভীতিঃ উৎস আর লক্ষণ', 'চিন্তা নিয়েই চিন্তা', 'জটমুক্তিঃ পরিবর্ত চিন্তার পথে', 'সুখের দিন গিয়াছে - পরীক্ষার কাল সমাগত', প্রস্তুতি মানেই জুতো পালিশ', 'বাবা - মায়েদের জন্য কিছু কথা' - এই কয়টি অধ্যায়ে সহজ সরলভাবে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে পরীক্ষা ভীতি কাটানোর জন্য যে পরামর্শ তিনি দিয়েছেন তাতে ছাত্রছাত্রীদের উপকার হবে একথা জোর দিয়েই বলা যায়।

পরীক্ষা মানেই জুজু নয়, ডা. গৌতম বন্দোপাধ্যায়, পরম্পরা প্রকাশন, মূল্য ৫০ টাকা

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে জরুরি আলোচনা

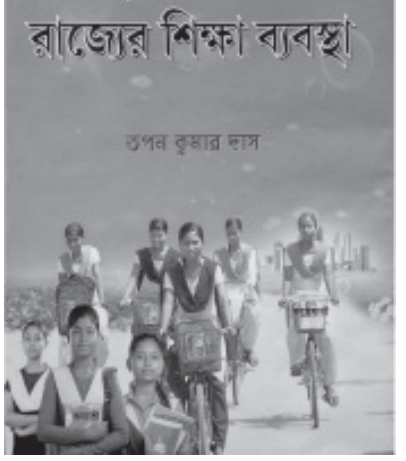

পেশায় শিক্ষক তপন কুমার দাস তাঁর পেশাগত দায়িত্বের বাইরেও শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে চর্চা ও লেখালেখির কাজ ধারাবাহিকভাবেই করে চলেছেন। সেই কাজের নতুন ফসল 'নতুন চিন্তাধারায় রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা'। মোট সাতটি অধ্যায়ে তিনি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'রাজ্যের নতুন শিক্ষাভাবনা', 'রাজ্য শিক্ষা কমিশনের শিক্ষা উন্নয়নে একগুচ্ছ প্রস্তাব' 'কন্যাশ্রী প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ', 'পরিবেশ রক্ষায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও স্বাস্থ্যবিধান', 'শিশুদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা', 'শিক্ষা প্রসারে কয়েকজন মনীষীদের কথা', 'শিশু শিক্ষায় শিক্ষাবিদদের ভূমিকা ও অবদান', - এই অধ্যায়গুলিতে প্রতিটি বিষয়েই লেখা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন। এক মলাটের মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক আলোচ্য বিষয়গুলিকে যেভাবে রেখেছেন তাতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপকৃতই হবেন বলে আশা করা যায়।

নতুন চিন্তাধারায় রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা, তপন কুমার দাস, দেবী বুক স্টল, হুগলী, মূল্য ২২০ টাকা

শিশু পাচার প্রতিরোধ এবং পকসো আইন নিয়ে আলোচনা

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের উদ্যোগে এবং জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সহায়তায় ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ কলকাতার কারিগরি ভবনে শিশু পাচার প্রতিরোধ ও শিশুর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন বিরোধী আইন, ২০১২ নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। পাচার হয়ে যাওয়া শিশুরা ফিরে আসার পরেও সরকারি বরাদ্দ না থাকায় ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না এই তথ্য উঠে আসে আলোচনাসভায়।

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপারসন অনন্যা চক্রবর্তী বলেন, 'সরকারের কোন দপ্তর থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা তুলে দেওয়া হবে, সেটাও চূড়ান্ত হচ্ছিল না প্রথমে। পরে সিদ্ধান্ত হয়, ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি ভিক্টিমদের হাতে ক্ষতিপূরণ তুলে দেবে।' আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সদস্য যশোবন্ত জৈন। সিআইডি-র আই জি অজয় রাণাডে জানান স্বয়ংসিদ্ধা প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিশু পাচার-বিরোধী প্রচার এবং সচেতনতা গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

দ্বিতীয় পর্বে শিশুর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন বিরোধী আইন, ২০১২ এবং তার প্রয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

বিভিন্ন জেলার পুলিশ আধিকারিক, জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক, শিশু সুরক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা এই আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন।

সংগঠন সংবাদ

শিশু সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা

গত ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুর, জেলার এগরা ২ নং ব্লকের দুবদা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সদস্যা, আইসিডিএস এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে শিশু সুরক্ষা, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ বিষয়ে আলোচনা হয়।

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ২ নং ব্লকের অন্তর্গত বাথুয়ারী গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত অস্তিচক উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ শিশু সুরক্ষা নিয়ে আলোচনার আয়োজন করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ এর সদস্য সুদেষ্ণা রায় এবং মৌমিতা চট্টোপাধ্যায়, জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সারদা দাস এবং সুস্মিতা সিংহ। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ওয়েবেনের রাজ্য কমিটির সদস্য তপনকুমার মণ্ডল। বিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী এবং তাঁদের অভিভাবক মিলিয়ে প্রায় ৬০০ জন উপস্থিত ছিলেন এই আলোচনাসভায়।

শিশু অধিকার দিবস

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের উদ্যোগে ২১ নভেম্বর, ২০১৭ কলকাতার পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার দিবস। এই অনুষ্ঠানে ২১ জন শিশুকে পুরস্কৃত করা হল সাহসিকতা ও শিশু অধিকার সুরক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য। শিশু অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে এই শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হল বীরাঙ্গনা ও বীরপুরুষ পুরস্কার। এই শিশুদের কেউ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করেছে, কেউ শিশু শ্রমিককে তার পেশা থেকে ছাড়িয়ে আবার বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করেছে, আবার কেউ পাচার বন্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে, সাহস করে পাচারকারীদের ধরিয়ে দিয়েছে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে তারা নিজেদের ও প্রতিবেশী শিশুদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শিশু অধিকার বিষয়ক সংবাদ ও লেখার জন্য সাংবাদিক ও নিবন্ধকারদের শিশুশ্রী পুরস্কারও এদিন তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিশু বিকাশ ও নারী উন্নয়ন মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি জানান শিশুদের বিকাশ ও অধিকার সুরক্ষায় সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের বতর্মান চেয়ার পারসন অনন্যা চক্রবর্তী ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোকেন্দু সেনগুপ্ত ছাড়াও আয়োগের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন। দুই শিশু শিল্পী অরুণা ও শায়েরি গান পরিবেশন করে। এদিনের অনুষ্ঠানে শিশুরা নাচ, ক্যারাটে সহ নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। শিশু সুরক্ষা আয়োগের চেয়ার পারসন সহ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকরা শিশুদের অধিকার নিয়ে উপস্থিত শিশুদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের সূচনা

যে সকল শিশুদের এবছর বীরাঙ্গনা ও বীরপুরুষ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় তাঁরা হলেন আকাঙ্ক্ষা সাহা, মুসকান খাতুন, সুস্মিতা ডাকুয়া, পূর্ণিমা পাল, বিষ্ণুপ্রিয়া রাণা, কামরুন্নেসা খাতুন, প্রথমা প্রতিহার, সাবানা খাতুন, পিঙ্কী দাস, অর্পিতা মান্না, ফাল্গুনী পন্ডা, পায়েল কুন্ডু, পূজা মজুমদার, বিপাশা সাহু, স্নেহা হালদার, জুলি রজক, ইমামুল হক মোল্লা, আকাশ গড়াই, সুমন মন্ডল, মোরারক সেখ এবং দেবশংকর দত্ত।

শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে

শিশুর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন ঃ এই সামাজিক ব্যাধি থেকে উত্তরণের উপায় কি?

সম্প্রতি একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিশুর উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে প্রচার মাধ্যম সরব হয়েছেন। অভিভাবকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষও প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন। যন্ত্রণা, কষ্ট, মানুষ সম্পর্কে অবিশ্বাস যাই হোক না কেন, বাস্তব সত্য এই যে সংবাদপত্রের পাতায় প্রায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে শিশুর বিরুদ্ধে নির্যাতন এবং যৌন নির্যাতনের ঘটনা। সংবাদপাত্রের পাতায় সব ঘটনার খবর প্রকাশিত হয় না। ঘটনার স্থান কাল পাত্রের ওপর নির্ভর করে কোন ঘটনা কতটা গুরুত্ব সহ প্রকাশিত হবে। তাই আমরা কিছু ঘটনা জানতে পারি, অধিকাংশই জানতে পারি না। কোন ঘটনা নিয়ে হইচই হবে, কোন ঘটনা খবরে প্রকাশিত হলেও কিছুদিনের মধ্যেই সব কিছুর আড়ালে চলে যাবে, তাও নির্ভর করে স্থান কাল পাত্রের ওপর। ধারাবাহিকভাবে এই সব খবর প্রকাশ থেকে এটুকু সহজেই বোঝা সম্ভব যে আরও বহু ঘটনা আমাদের অজানাই থেকে যায় এবং সমাজের গভীর অসুখ ক্রমশ আমাদের গ্রাস করছে। পরিবার, বিদ্যালয় যেখানে শিশুর নিরাপদ আশ্রয়, সেখানেই ঘটছে শিশুর ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা। অভিভাবক এবং শিক্ষকদের কাছ থেকেই শিশুর ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে শিশু তবে কোথায় নিরাপদ? শিশুর সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে দেশের নানা সনদ, নীতি, আইন, প্রকল্প, কমিশন আছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরে শিশু ও নারী কল্যাণ মন্ত্রক রয়েছে। জেলাস্তরে শিশু সুরক্ষা আধিকারিক রয়েছে, শিশু কল্যাণ সমিতি আছে। শিশু সুরক্ষায় প্রয়োজনের তুলনায় অর্থ বরাদ্দ কম হলেও অনেক টাকাই খরচ হয়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শিশু সুরক্ষায় কাজ করছে। প্রচার চলছে, কিন্তু ঘটনা ঘটেই চলেছে। সমস্যা তাহলে কোথায়?

ঘটনা ঘটার পরে অপরাধীর কঠিততম, শাস্তি, সিসিটিভি লাগিয়ে নজরদারি বাড়ানো ইত্যাদি দাবি, কিংবা প্রতিবাদ মিছিল, সভা, আলোচনাসভা ইত্যাদি চলে, আবার পাশাপাশি ঘটনাও ঘটে চলেছে। আইন প্রয়োগের সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়। কিন্তু এমন ঘটনা কেন ঘটছে আর ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে তার জন্য কী কী করা প্রয়োজন সে বিষয়ে খুব একটা আলোচনা শোনা যায় না।

যে মানুষটি অত্যাচার করে, সেই মানুষটি এমন অমানুষ কীভাবে তৈরি হল, কোন সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশে একজন মানুষ এই ধরনের ঘটনা ঘটবার দুঃসাহস পায়, সেই বিষয়গুলিও সমানভাবে চর্চা হওয়া প্রয়োজন। কারণ রোগ নির্ণয় করতে না পারলে যেমন চিকিৎসা করা সম্ভব হয়না, তেমনই সমস্যার উৎস নির্ণয় না করতে পারলে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কেউ বলবেন এটা মানসিক অসুস্থতা, আবার কেউ বলবেন বিকৃতি। কিন্তু এই অসুস্থতা বা বিকৃতির জন্ম কীভাবে হয় একজন মানুষের মধ্যে? শৈশব থেকে সামাজিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের মতো মানুষ হওয়ার পরিবর্তে কোন পরিবেশে একজন কীভাবে ধর্ষক হয়ে ওঠে সে বিষয়গুলিও যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার দাবি রাখে। এইজন্য কী কেবল সেই ব্যক্তি নিজেই দায়ী না সামাজিক নানা কারণও আছে? সে বিষয়েও চর্চা হওয়া প্রয়োজন।

দৈনিক সংবাদপত্র, দূরদর্শন, সিনেমা থেকে মোবাইল-ইন্টারনেট সর্বত্র যে ধরনের বিজ্ঞাপন এবং অসুস্থতা ও বিকৃতির প্রচার এবং প্রসার ধারাবাহিকভাবে হয়েই চলেছে, সেখানে কেন কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, এই প্রশ্ন কেন গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয় না, সেও এক প্রশ্ন।

মনে হতেই পারে সমাজের কর্তারা মূল প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে ওপর ওপর কিছুটা প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। মানুষের মানবিক গুণাবলী বিকাশের পরিবর্তে কেবলমাত্র একজন মানুষকে ক্রেতা এবং ভোগ্যপণ্যের ক্রেতা হিসেবে তৈরি করার যে প্রক্রিয়া সমাজে বিদ্যমান সেই পথ বন্ধ না হলে কি সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব?

সচেতনতা প্রসার যেমন প্রয়োজন, প্রতিবাদ যেমন প্রয়োজন, অপরাধীর শাস্তি যেমন প্রয়োজন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা কোথায়? সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল মানুষের মনুষত্ব্য বিকাশে কতটা সহায়তা করে কিংবা তাকে অমানুষ হিসেবে গড়ে তোলে সে চর্চাও জরুরি সমস্যা সমাধানের জন্য।

ভালবেসে পড়াও

১ পাতার পর ...

লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন, যাঁরা জানেন শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা; যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছিলেন. '... আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশ লাভ হয়না।' (শিক্ষার হেরফের)।

বলা বাহুল্য আমাদের দেশের অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের অনেকের কাছেই রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সারবস্তু উপলব্ধির স্তরে পৌঁছয়নি।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সমকালীন সমাজকাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট। শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষণ প্রক্রিয়া এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি পরস্পর সম্পর্কীত। বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও আমাদের সমাজ মানসে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রভাব এখনও যথেষ্ট গভীরে। তাই অভিভাবক থেকে শিক্ষক শিক্ষিকার একাংশ মনে করেন শাস্তি দেওয়া লেখাপড়ার আবশ্যিক অঙ্গ।

আনন্দদায়ক পাঠ, জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষা, শিক্ষা অধিকার আইন, উচ্চ আদালতের নির্দেশ, শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (SCERT) প্রকাশিত শিশু সুরক্ষা নীতি, সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ - এত উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীদের ওপর শিক্ষক শিক্ষিকাদের নানা ধরনের অত্যাচারের খবর মাঝে মধ্যেই সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হচ্ছে। কিছু হৈচৈ, তারপর আবার একই খবর। কেন বারবার ঘটছে এমন ঘটনা ?

শিশু মনস্তত্ত্ব, আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণার অভাব এবং সামাজিক বিভিন্ন কারণে অভিভাবক এবং শিক্ষক শিক্ষিকার নিজেদের মানসিক চাপও শিশুদের ওপর অত্যাচারের বড় কারণ। সামাজিক অন্যান্য সম্পর্ক ও পরিস্থিতি, মানসিকতার পরিবর্তন না করে কেবলমাত্র আইন করে শিশু নিগ্রহ কমানো সম্ভব বলে মনে হয় না।

শিশুকে ভালবাসতে না পারলে, শিশুর বন্ধু হতে না পারলে, শিশুর কাছ থেকেও শেখার মনোভাব না থাকলে, শিশু শিক্ষার সাথে যুক্ত হওয়া ঠিক নয়। শিশু শিক্ষার সাথে যুক্ত মানুষদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন সমাজমনের পরিবর্তন। অধিকাংশ অভিভাবক ও শিক্ষকদের আলাপ আলোচনায় দেখা যায় শিশুদের শাসন ও শাস্তি দেওয়া শিক্ষার অন্যতম হাতিয়ার বলেই তাঁরা মনে করেন। এই ধারণার পরিবর্তন না হলে কেবলমাত্র আইন ও নির্দেশিকা জারি করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মধ্যে বন্ধুত্ব ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক না থাকলে ভয়মুক্ত পরিবেশে শিশুদের শিক্ষা কল্পনাই থেকে যাবে, বাস্তবে সম্ভব হবে না।

শিশুটির আর্তনাদ যেন আমাদের গালে থাপ্পড় মেরে শেখাচ্ছে, কীভাবে শিশুদের পড়াতে হয়। সে বলছে ভালবেসে পড়াও। শিশুরাই আজ বড়দের বলে দিচ্ছে শাস্তি নয়, শেখানোর জন্য প্রয়োজন ভালবাসা।

যদিও সচেতনতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এখন সংখ্যায় অল্প হলেও বেশ কিছু শিক্ষক এবং অভিভাবক অন্যভাবে ভাবছেন এবং সেই অনুযায়ী তারা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁরা এই কাজ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। যে কোনও নতুন ভাবনা ও কাজ করতে গেলেই প্রথমে বাধা আসে, কিন্তু লক্ষ্যে অবিচল থাকলে সফলতা আসে।

শিক্ষা অধিকার আইন ঃ প্রয়োগ ও বাস্তবতা

গত ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরাম-এর উদ্যোগে কলকাতার সেবা কেন্দ্রে শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের উপস্থিতিতে সারাদিন ব্যাপী এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনাচক্রের ফোরামের পক্ষ থেকে রাজ্যে বিদ্যালয় শিক্ষার বর্তমান অবস্থা এবং শিশুর মুক্ত ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইনের রূপায়ণ বিষয়ে ফোরামের পক্ষ থেকে যে বক্তব্য ও প্রস্তাব রাখা হয় তা সমপথের পাঠকদের জন্য এখানে ছেপে দেওয়া হল।

শিক্ষার অধিকার আইনে কী আছে?

২০১০ সালের ১ এপ্রিল থেকে আমাদের রাজ্যে লাগু হয় একটি সময়োগযোগী কেন্দ্রীয় আইন, যা ''শিশুর মুক্ত ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন'' (Right of Children to free and compulsary Education Act - 2009) বা সংক্ষেপে RTE-2009 হিসেবে বেশি পরিচিত। এই আইন মোতাবেক খাতায় কলমে পরিবর্তিত হয় রাজ্যে পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং মূল্যায়নের নীতি পদ্ধতি। নতুনভাবে নির্ধারিত হয় শিখন-শিক্ষণের নীতি। নতুন করে রূপায়িত হয় সমস্ত পাঠ্যপুস্তক। এই নব রূপায়িত নীতির মূল ভিত্তিই হল, জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা - ২০০৫ এর সুপারিশগুলি। এই ''জাতীয়'' নথি অনুযায়ী শিখনের মূল ভিত্তি হল, ''ধারণা নির্মাণ ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা (INTERPRETATION CONSTRUCTION MODEL BASED LESSON PLAN) অর্থাৎ জ্ঞানের নির্মাণ (CONSTRUCTIVISM) ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা। যেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে কাঙ্খিত সামর্থ্য অনুযায়ী কোনও বিষয় / উপবিষয় ছাত্রছাত্রীদের শিখতে সাহায্য করবেন কিন্তু কোনও অবস্থাতেই সরাসরি বিষয়টা বলে দেবেন না, বরং ধাপে ধাপে শেখার জন্য বিভিন্ন 'শিখন পরিস্থিতি' তৈরি করবেন, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ঐ নির্দিষ্ট বিষয়টি শেখার চেষ্টা করবে। শিখন সম্পর্ণ হলে ঐ বিষয়টির অনুরূপ বিষয় তারা নিজে ব্যাখ্যা করবে এবং বিভিন্নভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত করবে। সারা বছর শিক্ষার্থীর শিখনের মান মূল্যায়নের জন্য চলবে নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন। পাঠ চলাকালীন এবং বছরের অন্তিম পর্বে, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে শিক্ষক শিক্ষিকা পুরো পদ্ধতির মূল্যায়ন করবেন। যেখানে শিক্ষা হবে শিশু কেন্দ্রিক, ভারহীন, মুক্ত এবং আনন্দদায়ক। দৈনন্দিন পাঠ চলাকালীন অর্থাৎ প্রস্তুতি পর্বের মূল্যায়নে যে যে বিষয়গুলি শিক্ষক শিক্ষিকারা নথি রাখবেন, সেগুলি হল - শিক্ষার্থীদের শিখনে আগ্রহ কেমন এবং তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কিনা, সে প্রশ্ন করছে কিনা, বিষয়টি নিজের মত ব্যাখ্যা দিতে পারছে কিনা, অন্য সকল শিশুর সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছে কিনা, শিশুর সৃষ্টিশীল মানসিকতা এবং নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটছে কিনা। এই পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য প্রতি শিক্ষক শিক্ষিকাকে বছরের বিভিন্ন সময় শিক্ষক-শিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মশালায় তালিম নিতে হবে। এই কর্মশালা আয়োজনের ভার নিতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় প্রশাসনকে।

এবার আসা যাক শিক্ষার অধিকার আইনের প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলিতে। সেখানে বলা আছে একটা স্কুলবাড়ি কেমন হবে, ঘরগুলির ন্যূনতম আয়তন কেমন হবে, তাতে আলো বাতাসের উপস্থিতি কেমন থাকবে এবং সর্বোপরি সে ঘরে সর্বাধিক কত ছাত্রছাত্রী বসবে। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যার ভিত্তিতে কতজন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী থাকবেন এসব বলা আছে এই আইনটিতে। বলা বাহুল্য প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলির সঙ্গে পঠনপাঠনের দিকটিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আইনে স্পষ্ট বলা আছে যে, দেশের জনগণনা, নির্বাচন ইত্যাদি সাংবিধানিক দায়িত্ব ছাড়া কোনও শিক্ষক শিক্ষিকাকে কোনওভাবেই পঠনপাঠন ব্যতীত কোনও রূপ প্রশাসনিক দায়িত্বে রাখা যাবে না।

শিশুর শিক্ষার অধিকার রক্ষায় কতটা এগিয়ে আমরা ?

রাজ্যের অধিকাংশ উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলবাড়িগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন কিছুটা আশাব্যঞ্জক হলেও, শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষার অধিকার আইনের পরিপন্থী। গ্রাম বাংলার বহু স্কুলেই এই অনুপাত ১২০ঃ১ বা তার চেয়েও কিছুটা বে শি। এই অনুপাতে ধারণা নির্মাণ ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা সর্বার্থেই অসম্ভব এবং অবাস্তব। কিন্তু সমস্যা আরও গভীর, ধারণা নির্মাণ ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কী ধরণের পাঠ পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বর্তমান স্কুলগুলিতে ? সক্রিয়তা ভিত্তিক অধ্যায় সমন্বিত পাঠ্য বইগুলির সঙ্গে সেই পাঠ পরিকল্পনা, পঠনপাঠন, প্রশ্নের ধরণ এবং মূল্যায়নের পদ্ধতি কতটা সংগতিপূর্ণ? পাঠ্য বইগুলি কি আদৌ কোনও কাজে লাগছে শিশুদের? নাকি পাঠ্য বইগুলির অব্যবহারের ফলে, উপযুক্ত পাঠ পরিকল্পনার অভাবে, একমাত্র সম্বল হিসেবে শিশুরা এবং তার শিক্ষক শিক্ষিকারা তুলে নিচ্ছেন পাঠ্য বইয়ের 'ছায়ায়' তৈরি সহায়িক বইগুলি? কী ধারণা পাচ্ছে এতে শিশুরা? মুখস্ত বিদ্যার চর্চাটাও কি হচ্ছে? নাকি সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে? এর উত্তর সকল ভুক্তভুগীরই জানা। আমরা যারা পাশফেল উঠে যাওয়ায়, গেল গেল রব তুলছি এবং আবেগে ভাসছি এই ভেবে যে, পাশফেলটা ফিরে এলেই হাল ফিরে যাবে এই মৃতপ্রায় বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার তারাই বা কতটা খবর রাখি স্কুলগুলোর? জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা প্রণয়নে, শিশুদের শিক্ষার-অধিকার বজায় রাখতে কতটা আন্তরিক আমরা? এর দায় কার? যদি ধরে নিই যে, শিক্ষার্থী - শিক্ষক অনুপাত বেশি থাকলেও, পাঠ্য বই অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা এবং পাঠদানের চেষ্টার দায় শিক্ষক শিক্ষিকার, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে যে, শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী সেই কর্মরত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের ধারণা নির্মাণ ভিত্তিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থায় কতটা সফল আইন অনুযায়ী সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় প্রশাসন? রাজ্যে ধারণা নির্মাণ ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনার জন্য উপযুক্ত মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কি নিয়েছে আমাদের প্রশাসন? বি.এড. পাঠ্যক্রমের ৬ মাস শিক্ষানবিশ হিসেবে যখন কর্মরত বা ভবিষ্যতের শিক্ষক শিক্ষিকারা কাজ করছেন? তখনও কি এমন কোনও ব্যবস্থা সুষমভাবে নেওয়া হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে? এর উত্তর প্রশাসনের অতি বড় গুণগ্রাহীর কাছেও নেতিবাচক হতে বাধ্য।

যদি কোনও নিরপেক্ষ সংস্থা মারফৎ পঠন পাঠন সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের শ্রেণি শিখনের এবং সার্বিক শিক্ষার গুণমানের প্রকৃত মূল্যায়ন হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, আমাদের রাজ্যে শিক্ষার অধিকার আইন লাগু হওয়ার পর ৬ থেকে ১৪ বছরের অধিকাংশ শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করা গেলেও, শিক্ষার মানের প্রশ্নে ক্রমশ অবনতি হচ্ছে, এর কারণ কী? অনেকে এককথায় বলবেন পাশফেল প্রথার অবলুপ্তিই এর মূল কারণ। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার যে, আইন মোতাবেক পাশফেল প্রথার অবলুপ্তির যে প্রয়াস আমরা দেখলাম, সেটা একটা পোশাকি মোড়ক ছাড়া কিছুই নয়। আসলে যেদিন থেকে গ্রাম বাংলায় স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অভাব প্রকট হয়েছে, শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত সহনশীলতার বাইরে চলে গেছে, যেদিন থেকে শিক্ষার্থীর শিখনের চাইতে, শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করাটাই মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে, সেদিন থেকে প্রকৃত অর্থে পাশফেল প্রথার অবলুপ্তি ঘটেছে। খোঁজ নিলেই জানা যাবে যে একটি বিষয়েও ন্যুনতম নম্বর না পেলেও আমরা বাধ্য হয়েছি তাকে উন্নীত করতে শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষে স্থান সংকুলানের জন্য। শিক্ষার অধিকার আইন শুধু এই পদ্ধতিতে সীলমোহর দিয়েছে। Promoted under Consideration লেখার পরিবর্তে passed and promoted এর সীলমোহর বসিয়েছি এই যা পার্থক্য। এ কথা হলফ করে বলা যায়, পাশফেল ফিরুক বা না ফিরুক শিক্ষক শিক্ষিকার পেশাগত, পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক প্রশিক্ষণ না করা গেলে, শিক্ষক শিক্ষিকার ঘাটতি পূরণ না হলে বিদ্যালয় শিক্ষার হাল ফেরানো একটা অলীক কল্পনা মাত্র।

শিক্ষার অধিকার আইনে বলা আছে পঠনপাঠন ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার কাজে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ব্যস্ত রাখা যাবে না। তারই বা কী অবস্থা? বাস্তব হল এই যে স্কুলে পঠনপাঠন ব্যতিরেকে শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবেচনা করে এবং তাদের সার্বিক সামাজিক উন্নতি সাধনে আমাদের রাজ্যসহ উন্নয়নমূলক প্রকল্প বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুর জন্য নির্দিষ্ট করেছে, যা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, এই সমস্ত প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা কিন্তু পাচ্ছে কেবল বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুরা, এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শিশু এবং তার অভিভাবককে বিদ্যালয় শিক্ষায় উৎসাহদানেই এই ব্যবস্থা, যাতে আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রভাব শিশুর পড়াশোনায় ছাপ না ফেলতে পারে। কিন্তু যে লক্ষ্যে সরকার বহু কোটি টাকা বিদ্যালয় শিক্ষায় খরচ করছে তার কতটা সুফল পাচ্ছে আমাদের শিশুরা? এই প্রশ্ন আজ সকল সচেতন নাগরিকের মনে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে এই সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির তত্ত্বাবধানে বহু শিক্ষকশিক্ষিকার শিখন-শিক্ষণ দিবস নষ্ট হচ্ছে, অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাকর্মী সংখ্যার চূড়ান্ত অভাবের জন্য, কোনও কোনও ক্ষেত্রে দক্ষ এবং প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাবে। রাজ্যে এরকম বহু বিদ্যালয় আছে যেখানে ৩০০০ জন ছাত্র পিছু একজন করণিক আছেন বা তাও নেই। শিক্ষকশিক্ষিকারা করণিকের সমস্ত কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন, নষ্ট হচ্ছে তাদের শিখন-শিক্ষণ দিবস। এতে ক্ষতি তিন পক্ষের প্রথমত সরকারের, বিশাল অঙ্কের টাকা বিদ্যালয় শিক্ষার পিছনে খরচ করেও শিখনের মান বাড়ানো তো যাচ্ছেই না, বরং তা ক্রমশ নিম্নমুখী হওয়ার প্রবণতা, দ্বিতীয়ত শিক্ষক শিক্ষিকা অর্থাৎ মানব সম্পদের যারা ধারণা নির্মাণ ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করবেন, শ্রেণি শিখনের মানোন্নয়নের জন্য ভাবছেন, তিনি কর্মদিবস অতিবাহিত করছেন অন্যান্য জরুরি কাজের জন্য, তৃতীয়ত, সবচেয়ে ক্ষতি শিক্ষার্থীর, যারা আমাদের ভবিষ্যত।

তবে একটা প্রশ্ন খুব প্রাসঙ্গিক এই যে, শিক্ষক নিয়োগ হলেও, শিক্ষার্থী শিক্ষক অনুপাত আইন সম্মত হলেও কি শ্রেণি শিখনে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখার সুপারিশগুলি কার্যকর করা যাবে? ধারণা নির্মাণ ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণি শিখন সম্ভব হবে? এর উত্তর কিন্তু নেতিবাচক। আমরা সবাই জানি আমাদের রাজ্যে সামগ্রিকভাবে শিক্ষক শিক্ষিকার অভাব প্রকট হলেও, বেশ কিছু জেলাতে কিন্তু শিক্ষার্থী শিক্ষক অনুপাত আইন মাফিক বা তার চেয়েও কম। ধরা যাক, আমাদের কাছের জেলা কলকাতার কথা, সেখানে অধিকাংশ বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে নয়, ধুঁকছে শিক্ষার্থীর অভাবে। তাহলে সেখানে কি হচ্ছে ধারণা ভিত্তিক শিখন, মূল্যায়ন? উত্তর নেতিবাচক । এর কারণ সরল অর্থে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ধারণা নির্মাণ ভিত্তিক পাঠদানের উপযুক্ত প্রশিক্ষণহীনতাকে দায়ী করা গেলেও, পুরোটা সত্যি বলা যাবে না। শিক্ষক শিক্ষিকাদের যা প্রশিক্ষণ আছে, এবং সর্বোপরি পাঠ্য বইয়ের ''শিখনের সুপারিশ'' মেনে পাঠ্য পুস্তক অনুযায়ী ও পাঠ্যক্রমের রূপরেখাকে মাথায় রেখে একটা চেষ্টাও কি দেখা যাচ্ছে ঐ স্কুলগুলিতে? মনে তো হয় না আমাদের। যদি সেই চেষ্টা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা না করে থাকি, তা তো আইন অমান্য করার সামিল। বলতেই হবে সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতার বড়ই অভাব আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের। সে কথা অবশ্য বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয় /মহাশয়াগণ ভাল বলতে পারবেন। আমাদের রাজ্যে স্কুলগুলিতে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে শিখন শিক্ষণ, প্রশাসনিক কাজ, পরিকাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে তদারকি করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে আছেন, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, তার করণেই আছেন প্রতিটি থানা ভিত্তিক আলাদা আলাদা সহকারী পরিদর্শক এবং জেলার প্রতি মহকুমায় একজন করে অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, একাধিক সহকারী পরিদর্শক এবং প্রতিটি ব্লকভিত্তিক চক্রে (সার্কেল) আছেন অন্তত একজন উপপরিদর্শক। এত পরিদর্শনের ব্যবস্থা সত্ত্বেও আমরা কি একটুকুও আশা করতে পারি না যে, যেখানে যেখানে পরিকাঠামোগত অসুবিধা নেই সেখানে সেখানে এই আইন অনুযায়ী, জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা অনুযায়ী পাঠদানের ব্যবস্থা থাকবে? কিন্তু তা যে নেই তা বলাই বাহুল্য।

আমাদের প্রস্তাব ঃ

- প্রথমত সরকারের কাছে আমরা যদি এই তথ্য পেতে পারি যে, বিভিন্ন জেলার কোন কোন বিদ্যালয়ে সঠিক শিখন পরিকাঠামো, মূলত বিষয় ভিত্তিকভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত আইন অনুযায়ী সঠিক, (আমাদের ধারণা সংখ্যাটা খুব কম নয়) তাহলে এক একটি জেলা ধরে অন্তত সেই বিদ্যালয়গুলিতে কেন ধারণা নির্মাণ পাঠদান করা সম্ভব হল না, তার একটা প্রাক সমীক্ষা করা। প্রয়োজনে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ধারণা নির্মাণ ভিত্তিক পাঠদান, মূল্যায়ন অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকগুলির ব্যবহার শুরু করা। তারপর সেই বিদ্যালয়গুলিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা ও তার নথি তৈরি করা। এই সম্পর্কিত প্রস্তাব সরকারের কাছে জমা দেওয়া যেতে পারে।
- যে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত, শিক্ষার্থী-শিক্ষাকর্মী অনুপাত সহনশীলতার বাইরে সেগুলিতে অবিলম্বে শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীর পদ পূরণ করার প্রস্তাব এবং সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।
- শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথাসম্ভব পঠনপাঠন ভিন্ন অন্যান্য কাজের ভার না দেওয়া, প্রয়োজনে উপযুক্ত সরকারি দপ্তর বা অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মারফৎ সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ বাইরে থেকে করানোর নির্দেশ দেওয়া এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের যাতে পঠনপাঠনের বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন, সেইমত ব্যবস্থা নেওয়া।
- সমস্ত বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বিশেষ করে পঠনপাঠন সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিরবচ্ছিন্ন পরিদর্শনের জন্য সরকারের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো।

শিক্ষা ও মূল্যবোধ

তপন কুমার দাস

শিক্ষা ও মূল্যবোধ বলা যেতে পারে পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষায় মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। আজ সারা বিশ্বে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যেভাবে হানাহানি চলছে তা বলা যেতে পারে মূল্যবোধহীন শিক্ষারই বর্হিপ্রকাশ। এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি এমন নিষ্ঠুর কাজ কখনই করতে পারেন না যদি তিনি মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হন। যেভাবে অসহিষ্ণুতা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে ভয় হয় গৃহযুদ্ধ বেঁধে যেতে আর হয়তো দেরি নেই।

আমরা জানি স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন- মানুষের মধ্যে প্রথম থেকেই যে পূর্ণতা রয়েছে তার বিকাশ সাধনই শিক্ষা। তাহলে শিক্ষাবোধ সম্পন্ন মানুষ কেন এমন করছেন? তার মধ্যে মূল্যবোধ নেই বলে।

মূল্যবোধ সম্পর্কে আমরা বলতে পারি- যে বোধ দিয়ে আমরা অন্য কোনো জিনিস মূল্যায়ন করি অর্থাৎ নিজের বুদ্ধি ও সক্ষমতার দ্বারা প্রতিটি জিনিস ও কাজের ভালো-মন্দ, দোষ-গুণ, বিচার-বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন করার মানসিকতাই মূল্যবোধ।

শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার। শিক্ষার অর্থ এই নয় যে শুধুমাত্র পাঠ্যবইয়ের মধ্যে শিশুকে ডুবে থাকতে হবে। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি নিজের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের এবং কৌতুহল থেকে শিশু যে শিক্ষা নেবে তা প্রকৃত শিক্ষা। এর মধ্যে মূল্যবোধ শিক্ষাটা অতীব জরুরি বিষয়। অর্থনীতির ভাষায় বলতে গেলে 'মূল্য' শব্দের অর্থ কোনো কিছুর দাম, আর 'বোধ' শব্দটি দ্বারা ব্যক্তির নৈতিকতাপূর্ণ মানসিক ভাবধারা বা আচরণকে

বোঝায়। বোধ শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা দেখতে পাই - জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মেধাশক্তি, চেতনা, অনুভব, উপলব্ধি ইত্যাদি। সুতরাং অর্থগতভাবে মূল্যবোধ বলতে আমরা বুঝি-মানব সমাজে কাঙ্খিত, সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং বুদ্ধিপ্রসূত নৈতিকতাপূর্ণ আচরণগুলোকে মূল্যবোধ বলা হয়।

মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ যেমন সচেতন হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে তেমনি শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির বৈচিত্রতা পরিপূর্ণ অবস্থায় সঞ্চারিত হয়। যা সমাজের নানা ক্ষেত্রে সুন্দর ও পরিপূর্ণ অবস্থায় সঞ্চারিত হয়। যা সমাজের নানা ক্ষেত্রে সুন্দর ও পরিপূর্ণ হতে সাহায্য করে। সমাজকে আলোকিত করার জন্য মূল্যবোধ একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। মূল্যবোধের মাধ্যমে মানুষে মানুষে মমত্ববোধ জাগ্রত হয় এবং নৈতিকতাপূর্ণ আচরণের বিকাশ ঘটায়। ব্যক্তি বিশেষের শিক্ষা, তার জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং পারস্পরিক মমত্ববোধ ও সহনশীলতাকে বাড়িয়ে তোলে। শিক্ষার সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতাকে আরও বেশি সম্প্রসারিত ও আলোকিত করে। শিক্ষবিদরা মূল্যবোধকে যেভাবে দেখেছেন তা হল- মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি মানবের সামাজিক ভূষণ। সমাজ জীবনে যার বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক পূর্বকোন' পত্রিকায় ড. মুহাম্মদ কামালউদ্দিন উল্লেখ করেছেন- মূল্যবোধ ব্যক্তিজীবনের আচরণ ও কথাবার্তায় এক ধরনের সুন্দর মানদণ্ড আনয়নে সহায়তা করে। শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল মানুষকে আদর্শ জীবনের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে অধিকার দিয়ে বসবাস করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। শিক্ষার চরম লক্ষ্য আদর্শ জীবন সৃষ্টি হলেও সেই আদর্শ জীবন সম্পূর্ণভাবে বস্তুনির্ভর নয় বা আধ্যাত্মিক কোনও ব্যাপার নয়। আদর্শজীবন লাভের জন্য প্রয়োজন মূল্যবোধ। সুতরাং নিঃসন্দেহে একথা বলা যেতে পারে ব্যক্তি জীবনে যখন মূল্যবোধ জাগ্রত হবে তখনই শিক্ষার চরম লক্ষ্য সাধিত হবে। তাই শিক্ষার আগেই মূল্যবোধ একান্ত প্রয়োজন। আদর্শ জীবন বলতে বুঝি, ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষা, জীবনাদর্শন ও মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটলে মানুষ আদর্শ জীবনের কাছে যেতে পারে।

আবার অন্যভাবে বলা যায়- মূল্যবোধের ভিত্তি হল ধর্ম ও দর্শন। দীর্ঘদিনের লালিত আচরণ-বিশ্বাস, সমাজের নিজস্ব আদর্শ ও নিয়ম নীতি। সব ধরনের অর্জিত মানবীয় গুণাবলি সম্পর্কে সমাজের মানুষের যে ধারণা সেগুলোই হল মূল্যবোধ।

সাধারণভাবে শিক্ষা এবং নির্দিষ্ট মূল্যবোধের শিক্ষা আধুনিক সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমান যুগ মূল্যবোধ অবক্ষয়ের যুগ। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের মানুষের মধ্যে প্রত্যাশিত মানবিক গুণগুলি ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। স্নেহ, ভালবাসা, আন্তরিকতা, আতিথেয়তা, নম্রতা, নির্ভরযোগ্যতা ইত্যাদি মানবিক গুণগুলি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। পরিবর্তে হিসা, বর্বরতা, দলাদলি, মিথ্যাচার, দুর্নীতি, ঈর্ষাপরায়নতা, অসুহিষ্ণুতা, স্বার্থপরতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, প্রভৃতি অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে চলেছে। এই বিষয়গুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে মূল্যবোধের নিদারুণ লোপ ও একান্তভাবে অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই কাল সন্ধিক্ষণে মূল্যবোধের শিক্ষা খুবই প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

স্বাধীনতার পরে ভারতে বিভিন্ন জাতীয় কমিশন এবং শিক্ষা কমিটিগুলি মূল্যবোধের শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সেই মতো পাঠ্যসূচিতে গুরুত্ব আরোপ করতে বলে। কোঠারি কমিশনের মতে মূল্যবোধহীন শিক্ষা সমাজের পক্ষে খুবই মারাত্মক। ১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতিতে মূল্যবোধের শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে মূল্যবোধের শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষা, নীতি শিক্ষা, বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা নামে পরিচিত ছিল। মূল্যবোধের শিক্ষা শব্দটি আধুনিক এবং অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও গ্রহণযোগ্য শব্দ। মূল্যবোধ হল সমাজ স্বীকৃত নীতি নিষ্ঠা, আচার আচরণ সমূহ এবং মূল্যবোধের শিক্ষা বলতে মানব সমাজ স্বীকৃত আচার আচরণ আয়ত্ব করার শিক্ষা। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের যে সাধারণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রাখা হয় সেগুলি মূল্যবোধের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধের বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ে সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি সঠিকভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন। পঠন-পাঠনের আগে প্রস্তুতি ও মনোসংযোগের জন্য প্রার্থনা, মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ, দিনের বৈশিষ্ঠতা প্রভৃতি বিষয়গুলি ও মহাপুরুষদের জন্মদিন পালন,জাতীয় দিবস পালন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা হয়। আরও বলা যেতে পারে বিদ্যালয়ের পরিবেশ মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিকতা, ঐতিহ্য, আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক প্রভৃতি নিয়ে কার্যাবলি পরিচালিত হয়। যেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা আত্ম-উৎসর্গের মনোভাব নিয়ে কাজ করে। যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকলের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, বোঝাপড়াই মূল লক্ষ্য যেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতঃস্ফুর্ততার সঙ্গে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী শিক্ষার্থীদের সুসম বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার উপর জোর দিয়ে গেছেন। এই ধরনের পরিবেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গড়ে তুলতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা ও যৌথ প্রয়াস।

পরিশেষে বলা যেতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তি জীবনের পথে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত চাহিদা ও সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে নিজস্ব একটি জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে পারে। এটাই হবে তার জীবন বিকাশের মূল। জীবনের যে কোনও ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে সে তার জীবনদর্শনের প্রেক্ষিতে বিচার করে এবং সেই অনুযায়ী অভিযোজনমূলক আচরণগুলি সম্পাদনা করে। ব্যক্তির এই জীবনদর্শনের সঙ্গে যুক্ত যে অনুভূতিমূলক কেন্দ্র তাকেই বলা হয় মূল্যবোধ।

মূল্যবোধের সংকট দেখা দিলে নানা সমস্যা দেখা দেয়। এই সংকট থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে বিদ্যালয়ে কিছু কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

শিক্ষককে যুগোপযোগী মূল্যবোধ সৃষ্টির দায়িত্ব নিতে হবে। সামাজিক রীতিনীতির বিশ্লেষণ ক্ষমতা গঠনের দায়িত্ব নিতে হবে। সমন্বয়ী মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে হবে। নৈতিক মান নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

একজন শিক্ষকই শিক্ষার্থীর এগিয়ে চলার পথকে সুগম করতে পারেন। আর আমরা সকলেই জানি শিক্ষায় শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব কতটা প্রয়োজন। নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া কোনও বড় ধরনের কাজ সম্ভব নয়। আর নিয়মানুবর্তিতা হল নিয়ন্ত্রিত জীবন। আর একজন চারিত্রিক গুণাবলির উপরেই নিয়মানুবর্তিতা সবচেয়ে ভালভাবে প্রকাশ পায়।

এককথায় বলতে গেলে 'মূল্যবোধ' শব্দের নিজস্ব অর্থ নেই। মূল্যবোধের পিছনের বাস্তবতাই মূল্যবোধকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। আর মূল্যবোধের প্রয়োগই হল জীবনের লক্ষ্য। মানব সংস্কৃতির বিবর্তনে এই মূল্যবোধ যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে সিংহভাগ মানুষ প্রতি মুহূর্তে মূল্যবোধের অবক্ষয়ে আবদ্ধ হচ্ছেন। প্রতিনিয়ত হিংসা, অমানবিকতায় জড়িয়ে পড়ছেন। কিন্তু মানুষ হিসাবে আমরা ভুলে যেতে বসেছি, ন্যায়, প্রেম, অহিংসা, সহযোগিতা, সহনশীলতা নামক শব্দগুলিকে। আর এই অবক্ষয় থেকে মুক্তি পেতে হলে জীবনধারা অবশ্যই পাল্টাতে হবে। নৈতিকতা দিয়ে মানব সমাজকে এক সূত্রে বাঁধতে হবে। আর এজন্যই প্রয়োজন শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া। আর শিক্ষার উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত মূল্যবোধের প্রসার ঘটানো।

শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধ

শিশুর বিরুদ্ধে নির্যাতন ও অপরাধের ঘটনা ঘটেই চলেছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো, সম্প্রতি যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আমরা সেখান থেকে শিশুদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান ও অবস্থান সমপথের পাঠকদের জন্য তুলে ধরলাম।

শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধঃ ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো, ২০১৬-এর তথ্য

ক্রমিক	রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	২০১৪	২০১৫	২০১৬	সারা দেশের তুলনায় রাজ্যের শতাংশ (২০১৬)	ঘটনা/শতংশের হারে রাজ্যের অবস্থান (২০১৬)
১.	অন্ধ্রপ্রদেশ	২০৫৯	১৯৯২	১৮৪৭	১.৭	১৭
২.	অরুণাচল প্রদেশ	১৩৪	১৮১	১৩৩	০.১	২৯
৩.	আসাম	১৩৮৫	২৮৩৫	৩৯৬৪	৩.৭	৯
৪.	বিহার	২২৫৫	১৯১৭	৩৯৩২	৩.৭	১০
৫.	ছত্তিশগড়	৪৩৫৮	৪৪৬৯	৪৭৪৬	৪.৪	৬
৬.	গোয়া	৩৩০	২৪২	২৩০	০.২	২৪
৭.	গুজরাট	৩২১৯	৩৬২৩	৩৬৩৭	৩.৪	১১
৮.	হরিয়ানা	২৫৪০	৩২৬২	৩০৯৯	২.৯	১৩
৯.	হিমাচলপ্রদেশ	৪৬৭	৪৭৭	৪৬৭	০.৪	২১
১০.	জম্মু ও কাশ্মীর	২১১	৩০৮	২২২	০.২	২৬
১১.	ঝাড়খণ্ড	৪২৩	৪০৬	৭১৭	০.৭	১৯
১২.	কর্ণাটক	৩৪১৬	৩৯৬১	৪৪৫৫	৪.২	৭
১৩.	কেরালা	২৩৯১	২৩৮৪	২৮৭৯	২.৭	১৫
১৪.	মধ্যপ্রদেশ	১৫০৮৫	১২৮৫৯	১৩৮৪৬	১২.৯	৩
১৫.	মহারাষ্ট্র	৮১১৫	১৩৯২১	১৪৫৫৯	১৩.৬	২
১৬.	মণিপুর	১৩৭	১১০	১৩৪	০.১	২৮
১৭.	মেঘালয়	২১৩	২৫৭	২৪০	০.২	২৩
১৮.	মিজোরাম	১৭৮	১৮৬	১৮৮	০.২	২৭
১৯.	নাগাল্যাণ্ড	২৫	৬১	৭৮	০.১	৩২
২০.	ওড়িষ্যা	২১৯৬	২৫৬২	৩২৮৬	৩.১	১২
২১.	পাঞ্জাব	১৭৬২	১৮৩৬	১৮৪৩	১.৭	১৮
২২.	রাজস্থান	৩৮৮০	৩৬৮৯	৪০৩৪	৩.৮	৮
২৩.	সিকিম	৯৩	৬৪	১১০	০.১	৩০
২৪.	তামিলনাড়ু	২৩৫৪	২৬১৭	২৮৫৬	২.৭	১৬
২৫.	তেলেঙ্গানা	১৯৩০	২৬৯৭	২৯০৯	২.৭	১৪
২৬.	ত্রিপুরা	৩৬৯	২৫৫	২৭৪	০.৩	২২
২৭.	উত্তরপ্রদেশ	১৪৮৩৫	১১৪২০	১৬০৭৯	১৫.০	১
২৮.	উত্তরাখণ্ড	৪৮৯	৬৩৫	৬৭৬	০.৬	২০
২৯.	**পশ্চিমবঙ্গ**	**৪৯০৯**	**৪৯৬৩**	**৭০০৪**	**৬.৫**	**৫**
	সব রাজ্য মোট	**৭৯৭৫৮**	**৮৪১৮৯**	**৯৮৩৪৪**	**৯১.৯**	
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল						
৩০.	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৫০	১০২	৮৬	০.১	৩১
৩১.	চণ্ডীগড়	২০৮	২৭১	২২২	০.২	২৫
৩২.	দাদ্রা ও নগর হাভেলী	১১	৩৫	২১	০.০	৩৫
৩৩.	দমন ও দিউ	৭	২৮	৩১	০.০	৩৪
৩৪.	দিল্লী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	৯৩৫০	৯৪৮৯	৮১৭৮	৭.৬	৪
৩৫.	লাক্ষাদ্বীপ	১	২	৫	০.০	৩৬
৩৬.	পণ্ডিচেরী	৩৮	৫৬	৭১	০.১	৩৩
	সব কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মোট	**৯৬৬৫**	**৯৯৮৩**	**৮৬১৪**	**৮.১**	
	সারাভারত মোট	**৮৯৪২৩**	**৯৪১৭২**	**১০৬৯৫৮**	**১০০.০**	

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক–এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা–৭০০০৩১ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
দূরভাষ: ০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল: wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট : wben.info মুদ্রণে: শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা–৭০০ ০০৯, দূরভাষ: ২২৪১ ৯৬৩৩ *অনুদান : ৬ টাকা*

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য